ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্বরূপের সৃষ্টি

শ্লোক ১

ঋষিরুবাচ

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

ঋষিঃ উবাচ—মৈত্রেয় ঋষি বললেন; ইতি—এইভাবে; তাসাম্—তাদের; স্ব-শক্তীনাম্—নিজের শক্তি; সতীনাম্—এইভাবে অবস্থিত হয়ে; অসমেত্য—মিশ্রণবিহীন; সঃ—তিনি (ভগবান); প্রসুপ্ত—নিষ্ক্রিয়; লোক-তন্ত্রাণাম্—বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে; নিশাম্য—শ্রবণ করে; গতিম্—উন্নতি; ঈশ্বরঃ—ভগবান।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন —এইভাবে ভগবান মহত্তত্ত্ব আদি তাঁর নিজস্ব শক্তির পরস্পর অমিলিতভাবে অবস্থানের জন্য বিশ্ব রচনার প্রসুপ্ত ভাব শ্রবণ করলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সৃষ্টিতে কোন কিছুরই অভাব নেই, সমস্ত শক্তি সেখানে প্রসুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সেইগুলি ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা মিলিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুরই প্রগতি সম্ভব নয়। সৃষ্টি রচনার প্রগতিশীল কার্যকলাপ ভগবানের নির্দেশনার ফলেই কেবল প্রসুপ্ত অবস্থা থেকে পুনঃপ্রবর্তিত হতে পারে।

শ্লোক ২

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ২ ॥

কাল-সংজ্ঞাম্—কালী নামক; **তদা**—তখন; **দেবীম্**—দেবী; **বিভ্রৎ**—ধ্বংসাত্মক; **শক্তিম্**—শক্তি; **উরুক্রমঃ**—পরম শক্তিমান; **ত্রয়ঃ-বিংশতি**—তেইশ; **তত্ত্বানাম্**—উপাদানের; **গণম্**—সেই সমস্ত; **যুগপৎ**—একসঙ্গে; **আবিশৎ**—প্রবিষ্ট হয়েছিল।

অনুবাদ

পরম শক্তিমান ভগবান তখন দেবী কালীসহ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এই কালী তাঁর বহিরঙ্গা প্রকৃতি, যিনি বিভিন্ন উপাদানগুলিকে সংশ্লিষ্ট করেন।

তাৎপর্য

জড় উপাদান তেইশটি—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, বাণী এবং মন। সেইগুলি কালের প্রভাবে একত্রে মিলিত হয় এবং পুনরায় কালের প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই কাল হচ্ছে ভগবানের শক্তি এবং তা ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ক্রিয়া করে। এই শক্তিকে বলা হয় *কালী,* তিনি কালো বর্ণের ধ্বংসকারিণী দেবীরূপে প্রকাশিতা, এবং যিনি সাধারণত জড় জগতে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিতা হন। বৈদিক মন্ত্রে এই প্রক্রিয়া বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ* । যে শক্তি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সংমিশ্রণের ফলে জড়া প্রকৃতিরূপে ক্রিয়াশীল হয়, তা সৃষ্টির চরম উৎস নয়। ভগবান জড় তত্ত্বসমূহে প্রবিষ্ট হয়ে কালী নামক তাঁর শক্তিকে নিয়োগ করেন। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এই একই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হয়েছে। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৫) বলা হয়েছে—

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি ভগবানের আদি স্বরূপ। তিনি মহাবিষ্ণু নামক তাঁর অংশের দ্বারা জড়া প্রকৃতিতে প্রবেশ করেন, এবং তারপর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, এবং তারপর ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি জড় উপাদানে, এমনকি, প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি পরমাণু উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রকার জাগতিক সৃষ্টি অসংখ্য।"

ভগবদ্‌গীতাতেও (১০/৪২) তা প্রতিপন্ন হয়েছে—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

"হে অর্জুন! বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল আমার অসংখ্য শক্তি সম্বন্ধে জানার কোন প্রয়োজন নেই। আমি পরমাত্মারূপী আমার অংশ প্রকাশের দ্বারা জড় সৃষ্টির প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রতিটি উপাদানে প্রবিষ্ট হই, এবং এইভাবে সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয়।" জড়া প্রকৃতির সমস্ত বিস্ময়কর কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে সম্পন্ন হয়, এবং তাই তিনি হচ্ছেন অন্তিম কারণ, বা সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৩

সোহনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্ ।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—তারপর এইভাবে প্রবেশ করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **চেষ্টা-রূপেণ**—কালীরূপী প্রচেষ্টার দ্বারা; **তম্**—তাদের; **গণম্**—দেবতাসহ সমস্ত জীবদের; **ভিন্নম্**—পৃথকভাবে; **সংযোজয়াম্ আস**—কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন; **সুপ্তম্**—সুপ্ত; **কর্ম**—কার্য; **প্রবোধয়ন্**—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

তারপর পরমেশ্বর ভগবান যখন তাঁর শক্তির দ্বারা ঐ সমস্ত তত্ত্বে প্রবেশ করলেন, তখন সমস্ত জীব বিভিন্ন কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হল, ঠিক যেমন মানুষ ঘুম থেকে উঠে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

তাৎপর্য

প্রলয়ের পর প্রতিটি জীব অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের অপরা শক্তিসহ ভগবানে প্রবেশ করে। এই সমস্ত জীবাত্মা হচ্ছে নিত্য বদ্ধ জীব, কিন্তু প্রত্যেক জড় সৃষ্টিতে তাদের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত জীব হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তাদের সকলকেই সুযোগ দেওয়া হয় যাতে বৈদিক জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করে তারা খুঁজে পায়—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি, কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, এবং এই প্রকার মুক্তিতে চরম লাভ কি। যথাযথভাবে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার ফলে মানুষ তার স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হতে পারে, এবং

এইভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত ভক্তি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে চিদাকাশে উন্নীত হতে পারে। জড় জগতে জীব তার প্রাক্তন অপূর্ণ বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপে যুক্ত হয়। নির্দিষ্ট শরীরের বিনাশের পর জীবাত্মা সব কিছু ভুলে যায়, কিন্তু প্রতিটি জীবের হৃদয়ে সাক্ষীরূপে ও পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরম করুণাময় ভগবান তাকে জাগিয়ে তার প্রাক্তন বাসনাগুলির কথা মনে করিয়ে দেন, এবং তার ফলে জীব তার পরবর্তী জীবনে সেইভাবে কর্ম করতে শুরু করে। এই অদৃশ্য পরিচালনাকে বলা হয় অদৃষ্ট, এবং বুদ্ধিমান মানুষেরা বুঝতে পারেন যে, এইটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের বন্ধনে তার আবদ্ধ থাকার কারণ।

কিছু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন দার্শনিকেরা আংশিক অথবা পূর্ণ প্রলয়ের পর জীবের চেতনাবিহীন সুপ্ত অবস্থাকে জীবনের অন্তিম অবস্থা বলে ভুল করে। আংশিক জড় দেহের বিনাশের পর জীব কেবল কয়েক মাস চেতনাবিহীন থাকে, এবং জড় সৃষ্টির সমগ্র প্রলয়ের পর জীব কোটি কোটি বছর ধরে অচেতন থাকে। কিন্তু সৃষ্টি যখন পুনরায় আরম্ভ হয়, তখন ভগবান কর্তৃক জাগরিত হয়ে জীব তার কার্যকলাপ আবার শুরু করে। জীব নিত্য, এবং কর্মের দ্বারা প্রকাশিত তার চেতনার জাগ্রত অবস্থাই তার জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। যখন সে জাগ্রত থাকে, তখন সে কর্ম না করে থাকতে পারে না, এবং এইভাবে সে তার বিভিন্ন বাসনা অনুসারে কর্ম করে। যখন সে তার বাসনাকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত করার শিক্ষা লাভ করে, তখন তার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং তখন তিনি চিদাকাশে উন্নীত হয়ে নিত্য জাগ্রত জীবন আস্বাদন করেন।

শ্লোক ৪

প্রবুদ্ধকর্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎস্বাভির্মাত্রাভিরধিপূরুষম্ ॥ ৪ ॥

প্রবুদ্ধ—জাগ্রত; **কর্মা**—কার্যকলাপ; **দৈবেন**—ভগবানের ইচ্ছায়; **ত্রয়ঃ-বিংশতিকঃ**—ত্রয়োবিংশতি মুখ্য তত্ত্বের দ্বারা; **গণঃ**—মিশ্রণ; **প্রেরিতঃ**—প্রণোদিত হয়ে; **অজনয়ৎ**—প্রকাশ করেছিলেন; **স্বাভিঃ**—তাঁর নিজের; **মাত্রাভিঃ**—অংশের দ্বারা; **অধিপূরুষম্**—বিশ্বরূপ।

অনুবাদ

যখন ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বসমূহ ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সক্রিয় হয়েছিল, তখন ভগবানের বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানের *বিরাটরূপ* বা *বিশ্বরূপ*, নির্বিশেষবাদীরা যার বহুমানন করেন, তা ভগবানের নিত্যরূপ নয়। জড় সৃষ্টির উপাদানগুলি প্রকাশ করার পর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে তার প্রকাশ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই *বিরাটরূপ* বা *বিশ্বরূপ* প্রদর্শন করেছিলেন যাতে নির্বিশেষবাদীরা বিশ্বাস করে যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরূপ প্রদর্শন করেছিলেন; এমন নয় যে, বিরাটরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদর্শন করেছিলেন। তাই বিরাটরূপ চিদাকাশে ভগবানের নিত্য রূপ নয়; এটি ভগবানের একটি জড় প্রকাশ। অর্চা-বিগ্রহ বা মন্দিরে ভগবানের শ্রীমূর্তিও নবীন ভক্তদের জন্য ভগবানের একই ধরনের একটি প্রকাশ। কিন্তু তাঁদের প্রাকৃত সংসর্গ থাকা সত্ত্বেও ভগবানের বিরাটরূপ অথবা অর্চা-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বরূপ থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৫

পরেণ বিশতা স্বস্মিন্মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্‌গণঃ ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিন্‌লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ৫ ॥

পরেণ—ভগবানের দ্বারা; **বিশতা**—এইভাবে প্রবেশ করে; **স্বস্মিন্**—নিজের দ্বারা; **মাত্রয়া**—অংশের দ্বারা; **বিশ্ব-সৃক্**—বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানসমূহ; **গণঃ**—সমস্ত; **চুক্ষোভ**—রূপান্তরিত হয়েছিল; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **আসাদ্য**—লাভ করে; **যস্মিন্**—যাতে; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **চর-অচরাঃ**—স্থাবর এবং জঙ্গম।

অনুবাদ

ভগবান যখন তাঁর অংশের দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টির উপাদানে প্রবেশ করলেন, তখন সেইগুলি বিরাটরূপে পরিণত হল, যাতে সমস্ত লোকসমূহ এবং চরাচর জগৎ অবস্থান করে।

তাৎপর্য

বিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি জড় এবং ভগবান তাঁর অংশের দ্বারা প্রবিষ্ট না হলে, সেগুলির আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তার অর্থ হচ্ছে, চিন্ময় স্পর্শ ব্যতীত জড় পদার্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে পারে না। জড় তত্ত্ব চিন্ময় তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং চিন্ময় তত্ত্বের স্পর্শের ফলে তার বৃদ্ধি হয়। সমগ্র

জড় সৃষ্টি আপনা থেকে বিরাটরূপ ধারণ করেনি, যা মূর্খ লোকেরা অনেক সময় ভ্রান্তিবশত অনুমান করে। যতক্ষণ জড় তত্ত্বে চিৎ তত্ত্ব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই কেবল জড় পদার্থ আবশ্যকতা অনুসারে বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু চিৎ তত্ত্ব ব্যতীত জড় পদার্থের বৃদ্ধি স্তব্ধ হয়। যেমন, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের জড় দেহে চিন্ময় আত্মা থাকে, দেহ প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু একটি মৃত দেহ যাতে চিন্ময় আত্মা নেই, তার কখনও বৃদ্ধি হয় না। ভগবদ্‌গীতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়) চিন্ময় চেতনার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, জড় দেহের নয়। আমাদের ক্ষুদ্র দেহের মতো একই প্রক্রিয়ায় সমগ্র বিশ্ব-বিগ্রহেরও বৃদ্ধি হয়। তবে মূর্খের মতো কারোরই মনে করা উচিত নয় যে, অণুসদৃশ স্বতন্ত্র জীবাত্মা সমগ্র বিশ্বের বিরাট প্রকাশ বিশ্বরূপের কারণ। সমগ্র বিশ্বের এই রূপকে *বিরাটরূপ* বলা হয়, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অংশের দ্বারা তাতে বিরাজমান।

শ্লোক ৬

হিরণ্ময়ঃ স পুরুষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ।
অণ্ডকোশ উবাসাপ্সু সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৬ ॥

হিরণ্ময়ঃ—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, যিনি বিরাটরূপ ধারণ করেন; **সঃ**—তিনি; **পুরুষঃ**—ভগবানের অবতার; **সহস্র**—এক হাজার; **পরিবৎসরান্**—দিব্য বৎসর; **অণ্ড-কোশে**—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে; **উবাস**—বাস করেছিলেন; **অপ্সু**—জলে; **সর্ব-সত্ত্ব**—তাঁর সঙ্গে শায়িত সমস্ত জীব; **উপবৃংহিতঃ**—এইভাবে বিস্তৃত।

অনুবাদ

হিরণ্ময় নামক বিরাট পুরুষ এক হাজার দিব্য বৎসর ব্রহ্মাণ্ডের জলে বাস করেছিলেন, এবং সমস্ত জীবেরাও তাঁর সঙ্গে শায়িত ছিল।

তাৎপর্য

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করার পর, ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ জলে পূর্ণ হয়েছিল। গ্রহমণ্ডল, অন্তরীক্ষ ইত্যাদি যা আমাদের গোচরীভূত হয়, তা কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধভাগ। ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিষ্ণুর প্রবেশ, এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক হাজার দিব্য বৎসর। মহত্তত্ত্বের গর্ভে সঞ্চারিত সমস্ত জীবেরা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিভক্ত হয়, এবং ব্রহ্মার জন্ম হওয়া

পর্যন্ত তারা সকলে ভগবানের সঙ্গে শায়িত থাকে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাই হচ্ছেন প্রথম জীব, এবং তা থেকে অন্য সমস্ত দেবতা ও জীবেদের জন্ম হয়। মনু হচ্ছে মানুষদের আদি পিতা, এবং তাই সংস্কৃত ভাষায় মানুষদের বলা হয় *মনুষ্য*। বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক গুণসম্পন্ন মনুষ্যজাতি বিভিন্ন গ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে।

শ্লোক ৭

স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দেবকর্মাত্মশক্তিমান্ ।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥ ৭ ॥

সঃ—সেই; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিরাটরূপের; **গর্ভঃ**—সমগ্র শক্তি; **দেব**—জীব-শক্তি; **কর্ম**—জীবনের ক্রিয়া; **আত্ম**—স্ব; **শক্তিমান্**—শক্তিসমূহে পূর্ণ; **বিবভাজ**—বিভক্ত; **আত্মনা**—নিজে নিজে; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **একধা**—একে; **দশধা**—দশে; **ত্রিধা**—এবং তিনে।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্বের সমগ্র শক্তি, বিরাটরূপে স্বয়ং নিজেকে জীবের জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি এবং আত্ম-শক্তিতে বিভক্ত করে, পুনরায় সেগুলিকে যথাযথভাবে এক, দশ এবং তিন প্রকারে বিভক্ত করলেন।

তাৎপর্য

চেতনা জীবের অথবা আত্মার লক্ষণ। জ্ঞান-শক্তি বা চেতনারূপে আত্মার অস্তিত্ব প্রকট হয়। সমগ্র চেতনা হচ্ছে বিরাটরূপের চেতনা, এবং সেই একই চেতনা প্রতিটি ব্যক্তিতেও প্রদর্শিত হয়। চেতনার ক্রিয়া প্রাণবায়ুর দ্বারা সম্পন্ন হয়, যা দশভাবে প্রকাশিত। জীবনের এই বায়ুগুলি হচ্ছে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান; এবং ভিন্ন প্রকারে তারা নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে পরিগণিত হয়। আত্মার চেতনা জড় পরিবেশের প্রভাবে কলুষিত হয়, এবং তার ফলে দেহাত্ম চেতনার অহঙ্কারে বিভিন্ন প্রকারের কার্যকলাপ প্রদর্শিত হয়। এই সমস্ত বিভিন্নমুখী কার্যকলাপকে ভগবদ্গীতায় (২/৪১) *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্* রূপে বর্ণিত হয়েছে। বদ্ধ জীব বিশুদ্ধ চেতনার অভাবে অনেক প্রকারের কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়। শুদ্ধ চেতনায় ক্রিয়া কেবল একটি। যখন ব্যষ্টি জীব এবং পরমাত্মার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, তখন জীবের চেতনা পরমেশ্বর ভগবানের চেতনার সঙ্গে এক হয়ে যায়।

অদ্বৈতবাদীরা মনে করে যে, চেতনা কেবল একটি, কিন্তু *সাত্বত* বা ভগবদ্ভক্তেরা জানেন, যদিও চেতনা নিঃসন্দেহে একটি, কিন্তু সেই একক চেতনার কারণ হচ্ছে ভাবের মিল। ব্যষ্টি চেতনাকে ভগবৎ চেতনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* । ব্যষ্টি চেতনাকে (অর্জুনকে) পরম চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার চেতনার পবিত্রতা সাধন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। চেতনার ক্রিয়াকে নিরোধ করার চেষ্টা মূর্খতামাত্র, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে চেতনাকে পবিত্র করা যায়। পবিত্রতার মাত্রা অনুসারে এই চেতনা তিন প্রকার আত্মিক বোধের স্তরে বিভক্ত—*আধ্যাত্মিক*, অথবা দেহ এবং মনকে স্বরূপ বলে মনে করা, *আধিভৌতিক*, অথবা জড় পদার্থের মধ্যে নিজের স্বরূপ অন্বেষণ করা, এবং *আধিদৈবিক*, অথবা ভগবানের সেবকরূপে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা। এই তিনটির মধ্যে *আধিদৈবিক* চেতনা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে চেতনার বিশুদ্ধিকরণের প্রারম্ভিক স্তর।

শ্লোক ৮

এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥ ৮ ॥

এষঃ—এই; **হি**—নিশ্চয়ই; **অশেষ**—অন্তহীন; **সত্ত্বানাম্**—জীবসমূহের; **আত্মা**—আত্মা; **অংশঃ**—অংশ; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **আদ্যঃ**—প্রথম; **অবতারঃ**—অবতার; **যত্র**—যেখানে; **অসৌ**—এই সমস্ত; **ভূত-গ্রামঃ**—সমগ্র সৃষ্টি; **বিভাব্যতে**—সংবর্ধিত হয়।

অনুবাদ

বিরাট পুরুষ পরমাত্মার প্রথম অবতার এবং অংশ। তিনি অসংখ্য জীবাত্মার আত্মা, এবং তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি বিরাজ করে, যা এইভাবে সংবর্ধিত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইভাবে নিজেকে বিস্তার করেন—স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশরূপে। তাঁর স্বাংশ প্রকাশেরা বিষ্ণুতত্ত্ব, এবং বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীবতত্ত্ব। যেহেতু জীবেরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই কখনও কখনও তাদের ভগবানের তটস্থা শক্তি

বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু যোগীরা মনে করে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। এইটি একটি বিরুদ্ধ মতবাদ; কেননা সৃষ্টিতে সব কিছুই ভগবানের বিরাটরূপের আশ্রয়ে বিরাজ করে।

শ্লোক ৯

সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা ।
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥

স-আধ্যাত্মঃ—দেহ এবং মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়; **স-আধিদৈবঃ**—ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ; **চ**—এবং; **স-আধিভূতঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ; **ইতি**—এইভাবে; **ত্রিধা**—তিন; **বিরাট্**—বিরাট; **প্রাণঃ**—প্রাণশক্তি; **দশ-বিধঃ**—দশ প্রকার; **একধা**—কেবল এক; **হৃদয়েন**—জীবনীশক্তি; **চ**—ও।

অনুবাদ

তিন, দশ এবং একের দ্বারা বিরাট পুরুষের প্রতিনিধিত্ব হয়, অর্থাৎ তিনিই শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়। তিনিই দশ প্রকার প্রাণশক্তির দ্বারা চালিত সমস্ত গতিবিধির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, এবং তিনিই এক হৃদয়, যেখানে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটি তত্ত্বই ভগবানের অপরা প্রকৃতিসম্ভূত, কিন্তু যে সমস্ত জীব এই অপরা প্রকৃতিকে ব্যবহার করে, মূলত তারা ভগবানের অন্তরঙ্গা পরা প্রকৃতিসম্ভূত। আটটি নিকৃষ্টা শক্তি স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে কার্য করে, কিন্তু উৎকৃষ্টা শক্তি কেন্দ্রীয় উৎপাদিকা শক্তিরূপে কার্য করে। মানব শরীরেও তা অনুভব করা যায়। মাটি ইত্যাদি স্থূল উপাদানগুলি স্থূল জড় শরীর সৃষ্টি করে, আর মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলি দিয়ে সূক্ষ্ম জড় দেহ তৈরি হয়; এই দুয়ের তুলনা অনেকটা কোট এবং অন্তর্বাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

দেহের গতিবিধি প্রথমে হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়, এবং দেহের সমস্ত কার্যকলাপ সম্ভব হয় দেহাভ্যন্তরস্থ দশ প্রকার বায়ুর দ্বারা চালিত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা। দশ প্রকার বায়ুর বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—নাসিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় যে মুখ্য বায়ু, তাকে বলা হয় *প্রাণ*, মলাশয় দিয়ে যে বায়ু মল নিষ্ক্রমণ করে, তাকে বলা

হয় *অপান*, যে বায়ু উদরে খাদ্যদ্রব্য সংযোজন করে এবং কখনও কখনও শব্দ করে ঢেকুর তোলায়, তাকে বলা হয় *সমান*, যে বায়ু কণ্ঠনালী দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং যার অবরোধের ফলে শ্বাস রোধ হয়, তাকে বলা হয় *উদান*, এবং যে সমগ্র বায়ু সারা শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত, তাকে বলা হয় *ব্যান*। এই পাঁচটি বায়ুর থেকে সূক্ষ্ম অন্য বায়ু রয়েছে, যা চক্ষু, মুখ ইত্যাদিকে বিস্তার করতে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *নাগ* বায়ু। যে বায়ু ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাকে বলা হয় *কৃকর*। যে বায়ু সংকোচনে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *কূর্ম*। যে বায়ু হাই তোলার মাধ্যমে ক্লান্তি দূরীকরণে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *দেবদত্ত*, এবং যে বায়ু পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় *ধনঞ্জয়*।

এই সমস্ত বায়ু হৃদয়ের কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত হয়, যা হচ্ছে এক। এই কেন্দ্রীয় শক্তিটি হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, যা দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে আত্মাসহ অবস্থান করে, এবং ভগবানের পরিচালনায় কার্য করে। তার বিশ্লেষণ করে ভগবদ্‌গীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥

সমগ্র কেন্দ্রীয় শক্তি ভগবানের দ্বারা হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়, যিনি সেখানে অবস্থান করে বদ্ধ জীবদের স্মরণে ও বিস্মরণে সহায়তা করেন। ভগবানের সঙ্গে তার দাসত্বের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলেই জীব বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভগবানকে যারা ভুলে থাকতে চায়, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তাঁকে ভুলে থাকতে ভগবানও তাদের সহায়তা করেন, আর যারা তাঁকে স্মরণ করতে চায়, তাঁর ভক্তের সঙ্গ প্রদানের মাধ্যমে ভগবান তাদের আরও বেশি করে স্মরণ করতে সাহায্য করেন। এইভাবে বদ্ধ জীব অবশেষে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

দিব্য সহায়তার এই প্রক্রিয়া ভগবদ্‌গীতায় (১০/১০) নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

মনের অতীত বুদ্ধির মাধ্যমে আত্ম উপলব্ধির জন্য বুদ্ধিযোগের (ভক্তিযোগের) পন্থাই কেবল এই সংসারের জড়জাগতিক বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করতে পারে। জীবের বদ্ধ অবস্থা বিরাট যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ মানুষের মতো। মনোধর্মী জ্ঞানীরা জন্ম-জন্মান্তরের জ্ঞানের সাধনার পর বুদ্ধিযোগের স্তরে উন্নীত হতে পারেন, কিন্তু মনের অতীত বুদ্ধির স্তর থেকে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পারমার্থিক প্রয়াস শুরু করেন, তিনি আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে অতি দ্রুত উন্নতি সাধন করতে পারেন। যেহেতু বুদ্ধিযোগের পন্থায় কোন রকম হ্রাস বা বিপথগামী হওয়ার ভয় থাকে না, তাই আত্ম উপলব্ধির এইটি হচ্ছে সুনিশ্চিত মার্গ, যা ভগবদ্গীতায় (২/৪০) প্রতিপন্ন হয়েছে। মনোধর্মী জ্ঞানীরা বুঝতে পারে না যে, (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে) দুটি পক্ষী আত্মা ও পরমাত্মা দেহরূপ একই বৃক্ষে অবস্থান করছে। স্বতন্ত্র আত্মা সেই বৃক্ষটির ফল আহার করে, আর পরমাত্মা সেই বৃক্ষের ফল আহার না করে কেবল আহাররত পক্ষীটির কার্যকলাপ দর্শন করেন। আসক্তিরহিত সাক্ষীস্বরূপ পক্ষীটি আহাররত পক্ষীটিকে ফলপ্রসূ কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি আত্মা ও পরমাত্মা অথবা ভগবান ও জীবের এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে নিশ্চয়ই এখনও ব্রহ্মাণ্ডরূপী যন্ত্রের জটিলতায় আবদ্ধ, এবং তার ফলে তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সময়ের প্রতীক্ষা করতেই হবে।

শ্লোক ১০

স্মরন্ বিশ্বসৃজামীশো বিজ্ঞাপিতমধোক্ষজঃ ।
বিরাজমতপৎস্বেন তেজসৈষাং বিবৃত্তয়ে ॥ ১০ ॥

স্মরন্—স্মরণ করে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন দেবতাদের; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিজ্ঞাপিতম্**—প্রার্থিত হয়ে; **অধোক্ষজঃ**—দিব্য; **বিরাজম্**—বিরাটরূপ; **অতপৎ**—এইভাবে বিবেচনা করেছিলেন; **স্বেন**—তাঁর নিজের দ্বারা; **তেজসা**—শক্তির দ্বারা; **এষাম্**—তাদের জন্য; **বিবৃত্তয়ে**—হৃদয়ঙ্গম করার জন্য।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্বসম্পন্ন সমস্ত দেবতাদের পরমাত্মা। (দেবতাগণ কর্তৃক) এইভাবে প্রার্থিত হয়ে তিনি নিজে নিজে বিচার করেছিলেন, এবং তাঁদের অবগতির জন্য বিরাটরূপের প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের বিরাটরূপের দ্বারা মোহিত হয়। তারা মনে করে যে, এই বিরাট প্রকাশের পিছনে যে একজন নিয়ন্তা রয়েছে, সেটি কেবল কল্পনামাত্র। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কার্যের আশ্চর্যজনক রূপ নিরীক্ষণ করে কারণের মূল্য এবং মহত্ত্ব অনুমান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মানুষের দেহ মাতৃগর্ভে আপনা থেকেই বিকশিত হয় না, কিন্তু যেহেতু সেই দেহের অভ্যন্তরে জীব বা আত্মা রয়েছে, তাই তার বিকাশ হয়। আত্মা ব্যতীত জড় দেহ রূপ প্রাপ্ত হতে পারে না অথবা বিকশিত হতে পারে না। যখনই কোন জড় পদার্থ বিকশিত হতে দেখা যায়, তখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে, তাতে একটি আত্মা রয়েছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশ বিকশিত হয়, ঠিক যেমন শিশুর শরীর বিকশিত হয়। তাই আমরা ধারণা করতে পারি যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছে, আর সেটিই যুক্তিযুক্ত। জড়বাদীরা যেমন হৃদয়ে আত্মা এবং পরমাত্মাকে খুঁজে পায় না, তেমনই, যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে তারা পরমাত্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপে দর্শন করতে পারে না। তাই বৈদিক পরিভাষায় ভগবানকে *অবাঙ্মনসগোচর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি বাক্য ও মনের ধারণার অতীত।

জ্ঞানের অভাবের ফলে মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনাকারীরা ভগবানকে বাক্য ও মনের সীমার মধ্যে নিয়ে আসতে চায়, কিন্তু ভগবান এইভাবে বোধগম্য হতে অস্বীকার করেন। মনোধর্মী কল্পনা-বিলাসীদের ভগবানের অনন্তত্ব মাপার উপযুক্ত বাণী অথবা বুদ্ধি নেই। ভগবানকে বলা হয় *অধোক্ষজ*, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সীমিত উপলব্ধির অতীত। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবানের অপ্রাকৃত নাম অথবা রূপ অনুভব করা যায় না। জড় পি-এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিতেরা তাদের সীমিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অনুমান করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। গর্বোদ্ধত পি-এইচ. ডি-দের এই প্রকার প্রচেষ্টা কূপমণ্ডুক-দর্শনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কুয়োর একটি ব্যাঙকে বিরাট প্রশান্ত মহাসাগরের তথ্য জানানো হয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার ও গভীরতা মাপবার জন্য এবং বোঝবার জন্য সে তার শরীরটি ফোলাতে আরম্ভ করে। তারপর অবশেষে শরীরটি ফেটে সেই ব্যাঙটির মৃত্যু হয়। পি-এইচ. ডি. উপাধিটির অর্থ Plough Department বা হাল চালানোর বিভাগ বলে বর্ণনা করা যায়, অর্থাৎ এই উপাধিটি ধানক্ষেতে হাল চালাতে উপযুক্ত ব্যক্তির উপাধি। ধানের ক্ষেতে হাল চালানোর মাধ্যমে যদি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং তার আশ্চর্যজনক কার্যকলাপের মূল কারণ হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টা করা হয়,

তাহলে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালত্ব মাপতে প্রয়াসী কূপমণ্ডুকের সঙ্গে সেই কার্যের তুলনা করা যেতে পারে।

যারা বিনীত এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাদেরই কাছে কেবল ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। জড়া প্রকৃতির উপাদান এবং ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বসমূহের নিয়ন্তা দেবতারা ভগবানের কাছে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, যা তিনি অর্জুনের অনুরোধেও করেছিলেন।

শ্লোক ১১

অথ তস্যাভিতপ্তস্য কতিধায়তনানি হ ।
নিরভিদ্যন্ত দেবানাং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥

অথ—অতএব; **তস্য**—তাঁর; **অভিতপ্তস্য**—তাঁর ধ্যান অনুসারে; **কতিধা**—কত; **আয়তনানি**—বিগ্রহ; **হ**—ছিল; **নিরভিদ্যন্ত**—ভিন্ন অংশের দ্বারা; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **তানি**—সেই সমস্ত; **মে গদতঃ**—আমার দ্বারা বর্ণিত; **শৃণু**—শ্রবণ করুন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিরাটরূপ প্রকাশ করার পর কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন দেবতারূপে পৃথকীকৃত করেছিলেন, তা এখন আপনি আমার কাছে শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

দেবতারা হচ্ছেন অন্য সমস্ত জীবাত্মাদের মতো পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্নাংশ। দেবতা ও সাধারণ জীবদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, কোন জীব যখন ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে পুণ্যকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এবং যখন তাঁদের জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনা নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাঁদের ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের পরিচালনার দায়িত্বভার সমন্বিত দেবতার পদে উন্নীত করা হয়।

শ্লোক ১২

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালোঽবিশৎপদম্ ।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১২ ॥

তস্য—তাঁর; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **আস্যম্**—মুখ; **নির্ভিন্নম্**—এইভাবে পৃথকীকৃত; **লোক-পালঃ**—জড়জাগতিক কার্যকলাপের নির্দেশক; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পদম্**—নিজ-নিজ পদে; **বাচা**—শব্দের দ্বারা; **স্ব-অংশেন**—তাঁর স্বীয় অংশের দ্বারা; **বক্তব্যম্**—বাণী; **যয়া**—যার দ্বারা; **অসৌ**—তারা; **প্রতিপদ্যতে**—ব্যক্ত করে।

অনুবাদ

তাঁর মুখ থেকে অগ্নি বা তাপ পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, সমস্ত লোকপালগণ তাঁদের স্বীয় স্থানসহ তাতে প্রবেশ করলেন। সেই বাক্‌শক্তির দ্বারাই জীব বাক্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

বিরাট পুরুষের মুখ হচ্ছে বাক্‌শক্তির উৎস। অগ্নির পরিচালক অগ্নিদেব হচ্ছেন তার নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা বা *আধিদৈব*। যে বাণী বলা হয়, তা হচ্ছে *আধ্যাত্ম* বা দেহের কার্য, এবং বাণীর বিষয়বস্তু জড় উপাদানসমূহ হচ্ছে *আধিভূত* তত্ত্ব।

শ্লোক ১৩

নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালোঽবিশদ্ধরেঃ ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

নির্ভিন্নম্—পৃথক; **তালু**—তালু; **বরুণঃ**—জলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; **লোক-পালঃ**—গ্রহসমূহের পরিচালক; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **জিহ্বয়া অংশেন**—জিহ্বার অংশে; **চ**—ও; **রসম্**—স্বাদ; **যয়া**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **প্রতিপদ্যতে**—ব্যক্ত করে।

অনুবাদ

যখন বিরাট পুরুষের তালু পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন লোকপাল বরুণ তাতে প্রবেশ করলেন। এইভাবে জীবের জিহ্বার দ্বারা সব কিছুর স্বাদ গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ হয়।

শ্লোক ১৪

নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্ ।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

নির্ভিন্নে—এইভাবে পৃথক হয়ে; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **নাসে**—দুই নাসারন্ধ্রের; **বিষ্ণোঃ**—ভগবানের; **আবিশতাম্**—প্রবেশ করে; **পদম্**—পদ; **ঘ্রাণেন অংশেন**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা; **গন্ধস্য**—গন্ধ; **প্রতিপত্তিঃ**—উপলব্ধি; **যতঃ**—যার ফলে; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

ভগবানের দুই নাসারন্ধ্র যখন পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁদের উপযুক্ত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব প্রত্যেক বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে।

শ্লোক ১৫

নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালোঽবিশদ্বিভোঃ ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

নির্ভিন্নে—এইভাবে পৃথক হয়ে; **অক্ষিণী**—নেত্র; **ত্বষ্টা**—সূর্য; **লোক-পালঃ**—আলোর পরিচালক; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বিভোঃ**—মহানের; **চক্ষুষা অংশেন**—চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **রূপাণাম্**—রূপের; **প্রতিপত্তিঃ**—উপলব্ধি; **যতঃ**—যার দ্বারা; **ভবেৎ**—হয়।

অনুবাদ

তারপর, বিরাট পুরুষের চক্ষুদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। আলোকের পরিচালক সূর্যদেব দৃষ্টিরূপ নিজ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, এবং তার ফলে জীব রূপ দর্শন করতে পারে।

শ্লোক ১৬

নির্ভিন্নান্যস্য চর্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

নির্ভিন্নানি—পৃথক হয়ে; **অস্য**—বিরাটরূপের; **চর্মাণি**—ত্বক; **লোক-পালঃ**—পরিচালক; **অনিলঃ**—বায়ু; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **প্রাণেন-অংশেন**—প্রাণবায়ুর অংশের দ্বারা; **সংস্পর্শম্**—স্পর্শ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **প্রতিপদ্যতে**—উপলব্ধি করতে পারে।

অনুবাদ

বিরাটরূপ থেকে যখন পৃথকভাবে ত্বকের প্রকাশ হয়, তখন বায়ুর পরিচালক লোকপাল অনিল স্পর্শেন্দ্রিয়সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দিশঃ ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥

কর্ণৌ—কর্ণ; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নৌ**—এইভাবে পৃথক হয়ে; **ধিষ্ণ্যম্**—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; **স্বম্**—স্বীয়; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **দিশঃ**—দিকসমূহের; **শ্রোত্রেণ অংশেন**—শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসমূহ; **শব্দস্য**—শব্দের; **সিদ্ধিম্**—পূর্ণতা; **যেন**—যার দ্বারা; **প্রপদ্যতে**—উপলব্ধি হয়।

অনুবাদ

যখন বিরাটরূপের কর্ণদ্বয় প্রকাশিত হয়, তখন দিকসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণ স্বীয় শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন, তার ফলে সমস্ত জীব শব্দ শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

জীবের দেহে শ্রবণেন্দ্রিয় হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। দূরস্থ এবং অজ্ঞাত বস্তুর সংবাদ গ্রহণ করার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে শব্দ। সমস্ত শব্দ অথবা জ্ঞানের পূর্ণতা কর্ণরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে মানুষের জীবন সার্থক করে। সমগ্র বৈদিক জ্ঞানের পন্থা কেবল শ্রবণের মাধ্যমে গৃহীত হয়ে থাকে, এবং তার ফলে শব্দ হচ্ছে জ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

শ্লোক ১৮

ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডুং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

ত্বচম্—ত্বক; অস্য—বিরাটরূপের; বিনির্ভিন্নাম্—ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে; বিবিশুঃ—প্রবেশ করেছিল; ধিষ্ণ্যম্—নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; ওষধীঃ—অনুভূতি; অংশেন—অংশসহ; রোমভিঃ—দেহের রোমের মাধ্যমে; কণ্ডূম্—চুলকানি; যৈঃ—যার দ্বারা; অসৌ—জীব; প্রতিপদ্যতে—অনুভব করে।

অনুবাদ

যখন ত্বক পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা তাঁর অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীবের স্পর্শজনিত সুখ এবং কণ্ডূয়ন বা চুলকানির অনুভব হয়।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয় অনুভূতির দুটি প্রধান বিষয় হচ্ছে স্পর্শ ও কণ্ডূয়ন, এবং তারা উভয়েই চর্ম ও দেহের রোমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, স্পর্শের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হচ্ছেন দেহাভ্যন্তরে প্রবাহিত অনিল, এবং রোমের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ওষধ্য। ত্বক ইন্দ্রিয়ের বিষয় হচ্ছে স্পর্শ, এবং দেহস্থ রোমের অনুভূতির বিষয় হচ্ছে কণ্ডূয়ন।

শ্লোক ১৯

মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

মেঢ্রম্—উপস্থ; তস্য—বিরাটরূপের; বিনির্ভিন্নম্—পৃথক হয়ে; স্ব-ধিষ্ণ্যম্—স্বীয় স্থান; কঃ—আদি জীব ব্রহ্মা; উপাবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; রেতসা অংশেন—বীর্যরূপ অংশসহ; যেন—যার দ্বারা; অসৌ—জীব; আনন্দম্—মৈথুন সুখ; প্রতিপদ্যতে—অনুভব করে।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের উপস্থ ইন্দ্রিয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা শুক্ররূপ অংশসহ সেই ইন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হলেন। তার ফলে জীব মৈথুন আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

শ্লোক ২০

গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥

গুদম্—পায়ু; **পুংসঃ**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নম্**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **মিত্রঃ**—সূর্যদেব; **লোক-ঈশঃ**—মিত্র নামক লোকপাল; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পায়ুনা অংশেন**—পায়ু অংশসহ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **বিসর্গম্**—মলত্যাগ; **প্রতিপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

বিরাট পুরুষের পায়ু পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, পায়ু ইন্দ্রিয়সহ লোকপাল সূর্য তাঁর অধিদেবতারূপে তাতে প্রবিষ্ট হন। তার ফলে জীব মল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২১

হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বর্পতিরাবিশৎ ।
বার্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে ॥ ২১ ॥

হস্তৌ—হস্তদ্বয়; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নৌ**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্বঃ-পতিঃ**—স্বর্গলোকের শাসক; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বার্তয়া অংশেন**—ক্রয়-বিক্রয় করার শক্তিসহ; **পুরুষঃ**—জীব; **যয়া**—যার দ্বারা; **বৃত্তিম্**—জীবনধারণের বৃত্তি; **প্রপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর যখন বিরাট পুরুষের হস্তদ্বয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্বর্গলোকের শাসক ইন্দ্র তাতে প্রবেশ করলেন। তার ফলে জীব তার জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২২

পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২॥

পাদৌ—পদদ্বয়; অস্য—বিরাটরূপের; বিনির্ভিন্নৌ—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; লোক-ঈশঃ বিষ্ণুঃ—দেবতা বিষ্ণু (পরমেশ্বর ভগবান নন); আবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; গত্যা—গমন শক্তির দ্বারা; স্ব-অংশেন—তাঁর স্বীয় অংশসহ; পুরুষঃ—জীব; যয়া—যার দ্বারা; প্রাপ্যম্—গন্তব্যস্থল; প্রপদ্যতে—পৌঁছায়।

অনুবাদ

তারপর বিরাটরূপের পদদ্বয় পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়, এবং তার ফলে বিষ্ণু নামক দেবতা (পরমেশ্বর ভগবান নন) গমনরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২৩

বুদ্ধিং চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

বুদ্ধিম্—বুদ্ধি; চ—ও; অস্য—বিরাটরূপের; বিনির্ভিন্নাম্—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; বাক্-ঈশঃ—ব্রহ্মা, বেদের ঈশ্বর; ধিষ্ণ্যম্—নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি; আবিশৎ—প্রবেশ করে; বোধেন অংশেন—বুদ্ধিরূপ নিজ অংশসহ; বোদ্ধব্যম্—জ্ঞাতব্য; প্রতিপত্তিঃ—বুঝেছিল; যতঃ—যার দ্বারা; ভবেৎ—হয়।

অনুবাদ

বিরাটরূপের বুদ্ধি যখন পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা তাঁর বোধরূপ অংশসহ তাতে প্রবেশ করেন। তার ফলে জীব জ্ঞাতব্য বিষয় উপলব্ধি করতে পারে।

শ্লোক ২৪

হৃদয়ং চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥

হৃদয়ম্—হৃদয়; চ—ও; অস্য—বিরাটরূপের; নির্ভিন্নম্—পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়ে; চন্দ্রমা—চন্দ্রদেব; ধিষ্ণ্যম্—নিয়ন্ত্রণ শক্তিসহ; আবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন;

মনসাঅংশেন—মানসিক ক্রিয়ারূপ অংশসহ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **বিক্রিয়াম্**—সংকল্প; **প্রতিপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর, বিরাট পুরুষের হৃদয় পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়, এবং চন্দ্রদেব মনরূপ স্বীয় অংশসহ তাতে প্রবেশ করলেন। জীব সেই মনের দ্বারা সংকল্প আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

শ্লোক ২৫

আত্মানং চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎপদম্ ।
কর্মণাংশেন যেনাসৌ কর্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

আত্মানম্—অহঙ্কার; **চ**—ও; **অস্য**—বিরাটরূপের; **নির্ভিন্নম্**—পৃথকরূপে প্রকাশিত হয়ে; **অভিমানঃ**—ভ্রান্ত পরিচিতি; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পদম্**—পদে; **কর্মণা**—কার্যকলাপ; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **কর্তব্যম্**—কর্তব্যকর্ম; **প্রতিপদ্যতে**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

তারপর, বিরাট পুরুষের অহঙ্কার পৃথকরূপে প্রকাশিত হলে, অহঙ্কারের নিয়ন্তা রুদ্র অহং বৃত্তিরূপ অংশসহ তাতে প্রবিষ্ট হন। সেই অহং বৃত্তির দ্বারা জীব কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে।

তাৎপর্য

অহঙ্কারের নিয়ন্তা হচ্ছেন শিবের অবতার রুদ্রদেব। রুদ্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার, যিনি জড়া প্রকৃতিতে তমোগুণ নিয়ন্ত্রণ করেন। অহঙ্কারের কার্যকলাপ দেহ ও মনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অহঙ্কারের দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ ব্যক্তি শিব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হন। কেউ যখন অজ্ঞানের সূক্ষ্মতর স্তরে পৌঁছায়, তখন সে ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। বদ্ধ জীবের অহঙ্কার সমগ্র জড় জগতের নিয়ন্ত্রণকারী মায়াশক্তির চরম ফাঁদ।

শ্লোক ২৬

সত্ত্বং চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্‌ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

সত্ত্বম্—চেতনা; **চ**—ও; **অস্য**—বিরাটরূপের; **বিনির্ভিন্নম্**—ভিন্নরূপে প্রকাশিত; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **ধিষ্ণ্যম্**—নিয়ন্ত্রণসহ; **উপাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **চিত্তেন অংশেন**—তার চেতনার অংশসহ; **যেন**—যার দ্বারা; **অসৌ**—জীব; **বিজ্ঞানম্**—বিশেষ জ্ঞান; **প্রতিপদ্যতে**—সম্পন্ন করে।

অনুবাদ

তারপর, তাঁর চেতনা যখন ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, তখন মহত্তত্ত্ব তার আংশিক চেতনাসহ তাতে প্রবেশ করে। এইভাবে জীব বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হতে সক্ষম হয়।

শ্লোক ২৭

শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যত ।
গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥

শীর্ষ্ণঃ—মস্তক; **অস্য**—বিরাটরূপের; **দ্যৌঃ**—স্বর্গলোক; **ধরা**—পৃথিবী; **পদ্ভ্যাম্**—তাঁর পায়ে; **খম্**—আকাশ; **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **উদপদ্যত**—প্রকাশিত হয়; **গুণানাম্**—প্রকৃতির তিন গুণের; **বৃত্তয়ঃ**—প্রতিক্রিয়া; **যেষু**—যাতে; **প্রতীয়ন্তে**—প্রকট হয়; **সুর-আদয়ঃ**—দেব, অসুর, নর প্রভৃতি।

অনুবাদ

তারপর, বিরাটরূপের মস্তক থেকে স্বর্গলোক প্রকাশিত হয়, পদদ্বয় থেকে পৃথিবী এবং নাভিদেশ থেকে আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থানে জড়া প্রকৃতির গুণ অনুসারে দেবতা প্রভৃতি প্রকট হয়।

শ্লোক ২৮

আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে ।
ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তাননু ॥ ২৮ ॥

আত্যন্তিকেন—অত্যধিক; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণ দ্বারা; **দিবম্**—উচ্চতর লোকে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **প্রপেদিরে**—অবস্থিত হয়েছে; **ধরাম্**—পৃথিবীতে; **রজঃ**—রজোগুণ; **স্বভাবেন**—প্রকৃতির দ্বারা; **পণয়ঃ**—মানব; **যে**—সেই সমস্ত; **চ**—ও; **তান্**—তাদের; **অনু**—অধীন।

অনুবাদ

সত্ত্বগুণের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে দেবতারা স্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত হয়, আর রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত মানব তাদের অধীনস্থ জীবসহ পৃথিবীতে বাস করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৪/১৪-১৫) বলা হয়েছে যে, যাঁরা সত্ত্বগুণে অতি উন্নত হয়ে বিকশিত হয়েছেন তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হন, আর যারা রজোগুণের দ্বারা অভিভূত, তারা পৃথিবী আদি মধ্যবর্তীলোকে বাস করে। কিন্তু যারা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা নিম্নতর লোক অথবা পশুজীবন প্রাপ্ত হয়। দেবতারা সত্ত্বগুণে অতি উন্নতভাবে বিকশিত, এবং তাই তাঁরা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন। মনুষ্যেতর স্তরে রয়েছে পশুগণ, যদিও তাদের মধ্যে গাভী, অশ্ব, কুকুর ইত্যাদি পশু মানবসমাজের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং মানুষের সংরক্ষণে বাস করতে অভ্যস্ত।

এই শ্লোকে *আত্যন্তিকেন* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সত্ত্বগুণের বিকাশের ফলে জীব স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু রজ এবং তমোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে, মানুষ পশুহত্যায় লিপ্ত হয়, যে সমস্ত পশুরা প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজ কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার কথা। যারা অনর্থক পশুহত্যায় লিপ্ত হয়, তারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা অত্যন্ত আচ্ছন্ন হয়, এবং তাদের সত্ত্বগুণে উন্নীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জীবনের নিম্ন স্তরে অধঃপতিত হওয়াই তাদের নিয়তি। বিভিন্ন লোকের উচ্চ এবং নিম্নতর স্থিতি নির্ধারিত হয় সেই সমস্ত স্থানে নিবাসকারী জীবদের শ্রেণী অনুসারে।

শ্লোক ২৯

তার্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ ।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥ ২৯ ॥

তার্তীয়েন—জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির দ্বারা; **স্বভাবেন**—এই প্রকার প্রকৃতির দ্বারা; **ভগবৎ-নাভিম্**—পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের নাভি প্রদেশ; **আশ্রিতাঃ**—যারা এইভাবে আশ্রিত হয়েছে; **উভয়োঃ**—উভয়ের মধ্যে; **অন্তরম্**—মাঝখানে; **ব্যোম**—আকাশ; **যে**—তারা সকলে; **রুদ্র-পার্ষদাম্**—রুদ্রের সহচর; **গণাঃ**—জনসমূহ।

অনুবাদ

যে সমস্ত জীব রুদ্রের পার্ষদ, তারা জড়া প্রকৃতির তৃতীয় গুণ তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা পৃথিবী এবং স্বর্গলোকের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষে অবস্থিত।

তাৎপর্য

অন্তরীক্ষের মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় ভুবর্লোক, এবং এই তত্ত্ব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীল জীব গোস্বামী উভয়েই প্রতিপন্ন করেছেন। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা রজোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। যাঁরা সত্ত্বগুণে অবস্থিত, তাঁরা দেবলোকে উন্নীত হন; যারা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তারা মানবসমাজে স্থাপিত হয়; আর যারা তমোগুণে অবস্থিত, তারা পশু-সমাজে অথবা প্রেতলোকে অধিষ্ঠিত হয়। এই সিদ্ধান্তের কোন মতবিরোধ নেই। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে অসংখ্য জীব ছড়িয়ে রয়েছে, এবং তারা তাদের গুণ অনুসারে স্ব-স্ব স্থানে অবস্থিত.

শ্লোক ৩০

মুখতোঽবর্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৩০ ॥

মুখতঃ—মুখ থেকে; **অবর্তত**—উৎপন্ন হয়েছে; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **পুরুষস্য**—বিরাট পুরুষের; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **যঃ**—যিনি; **তু**—তার ফলে; **উন্মুখত্বাৎ**—প্রবণতাসম্পন্ন; **বর্ণানাম্**—সমাজের বিভিন্ন বর্ণের; **মুখ্যঃ**—প্রধান; **অভূৎ**—হয়েছিল; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ নামক; **গুরুঃ**—স্বীকৃতি প্রাপ্ত শিক্ষক বা গুরু।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বিরাট পুরুষের মুখ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাঁরা এই বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তাঁরা সমাজের অন্যান্য বর্ণের প্রকৃত শিক্ষক ও পারমার্থিক পথপ্রদর্শক।

তাৎপর্য

ভগবদ্‌গীতায় (৪/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মানবসমাজের চারটি বর্ণের বিকাশ ভগবানের বিরাটরূপ থেকে হয়েছে। শরীরের বিভাগগুলি হচ্ছে মুখ, বাহু, উদর এবং চরণ। যাঁরা মুখে অবস্থিত, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ; যারা বাহুতে অবস্থিত, তাদের বলা হয় ক্ষত্রিয়; যারা উদরে অবস্থিত, তাদের বলা হয় বৈশ্য; আর যারা চরণে অবস্থিত, তাদের বলা হয় শূদ্র। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপে অবস্থিত। তাই, শরীরের বিশেষ অংশে অবস্থিত হওয়ার ফলে, কোন বর্ণকেই নীচ বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও হাত অথবা পায়ের প্রতি আমাদের আচরণে আমরা পার্থক্য প্রদর্শন করি না। দেহের প্রতিটি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ, তবে দেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মুখের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি। শরীরের অন্যান্য অংশগুলি কেটে ফেললেও মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু যদি তার মুখ কেটে ফেলা হয়, তাহলে সে আর বাঁচতে পারে না। তাই, ভগবানের শরীরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিকে বলা হয় ব্রাহ্মণদের নিবাসস্থল, যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ। যারা বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ না হয়ে জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত, ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেও তাদের ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ব্রাহ্মণ পিতার পুত্র হওয়াই ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যতা নয়। ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ হওয়া। বেদ ভগবানের মুখে অবস্থিত, এবং তাই যাঁরা বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখ, তাঁরা অবশ্যই ভগবানের মুখে অবস্থিত, এবং তাঁরাই হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। বৈদিক জ্ঞানের প্রতি এই অনুরাগ কোন বিশেষ বর্ণ বা সম্প্রদায়ে সীমিত নয়। পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন পরিবারের মানুষ বৈদিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত হতে পারেন, এবং সেইটি হচ্ছে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যতা।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ হচ্ছেন স্বাভাবিক শিক্ষক বা পারমার্থিক গুরু। বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত না হলে কখনও গুরু হওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানকে জানাই হচ্ছে বৈদিক জ্ঞানের পূর্ণতা, এবং সেইটিই হচ্ছে বেদান্ত। যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী অথচ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারা ব্রাহ্মণ হলেও গুরু হতে পারে না। সেই কথা পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

নির্বিশেষবাদী যোগ্য ব্রাহ্মণ হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অথবা বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি গুরু হতে পারেন না। আধুনিক যুগে বৈদিক জ্ঞানের মহান আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥

কোন ব্যক্তি, তা তিনি ব্রাহ্মণ হন, শূদ্র হন অথবা সন্ন্যাসী হন, তাতে কিছু যায় আসে না; তিনি যদি কৃষ্ণতত্ত্ববিদ হন, তাহলে তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য (চৈঃ চঃ মধ্য ৮/১২৮)। অতএব যোগ্য ব্রাহ্মণ হওয়াই গুরু হওয়ার যোগ্যতা নয়, গুরু হওয়ার প্রকৃত যোগ্যতা হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হওয়া।

যিনি বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী, তিনি ব্রাহ্মণ। আর যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞানের সমস্ত সূক্ষ্ম রহস্য সম্বন্ধে অবগত শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনিই কেবল গুরু হতে পারেন।

শ্লোক ৩১

বাহুভ্যোঽবর্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥ ৩১ ॥

বাহুভ্যঃ—বাহুযুগল থেকে; **অবর্তত**—উৎপন্ন হয়েছে; **ক্ষত্রম্**—রক্ষা করার শক্তি; **ক্ষত্রিয়ঃ**—রক্ষা করার শক্তি সম্বন্ধীয়; **তৎ**—তা; **অনুব্রতঃ**—অনুগামী; **যঃ**—যিনি; **জাতঃ**—এই প্রকার হয়; **ত্রায়তে**—ত্রাণ করে; **বর্ণান্**—অন্য বর্ণদের; **পৌরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি; **কণ্টক**—চোর, লম্পট আদি উৎপাত সৃষ্টিকারীদের; **ক্ষতাৎ**—দুষ্কর্ম থেকে।

অনুবাদ

তারপর সেই বিরাট পুরুষের বাহুযুগল থেকে পালন করার বৃত্তি, এবং সেই বৃত্তির অনুসরণকারী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হচ্ছে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

তাৎপর্য

দিব্য বৈদিক জ্ঞানের প্রতি উন্মুখতা থেকে যেমন ব্রাহ্মণকে চেনা যায়, তেমনই চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে সমাজকে রক্ষা করার ক্ষমতা থেকে ক্ষত্রিয়কে চেনা যায়। এখানে অনুব্রতঃ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের থেকে যিনি সমাজকে রক্ষা করেন, তাঁকে বলা হয় ক্ষত্রিয়;

কেবল ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করলেই ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না। বর্ণ ব্যবস্থা সর্ব অবস্থাতেই গুণভিত্তিক, জন্মভিত্তিক নয়। জন্ম কেবল একটি বাহ্যিক নিমিত্ত; তা কখনই বর্ণ-বিভাগের মূল ভিত্তি নয়। ভগবদ্গীতায় (১৮/৪১-৪৪) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের গুণাবলী সুনিশ্চিতভাবে নিরূপিত হয়েছে, এবং তা থেকে বোঝা যায় যে, সেই গুণগুলি কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সর্বদা পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনও কখনও জীবদেরও পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়, তবুও, বস্তুতপক্ষে তারা হচ্ছে পুরুষ-শক্তি বা পুরুষের উৎকৃষ্টা শক্তি (পরা শক্তি বা পরা প্রকৃতি)। পুরুষের (ভগবানের) বহিরঙ্গা শক্তি কর্তৃক মোহিত হয়ে জীব ভ্রান্তিবশত নিজেদের পুরুষ বলে মনে করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাদের নেই। রক্ষা করার শক্তি ভগবানের রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন দেবতাদের মধ্যে প্রথমের সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে, দ্বিতীয়ের রক্ষা করার শক্তি রয়েছে, এবং তৃতীয়ের সংহার করার শক্তি রয়েছে। এই শ্লোকে *পুরুষ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা যেন পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে স্থলে ও জলে উৎপন্ন সমস্ত প্রজাদের পালন করেন। তাই পালন বলতে মানুষ এবং পশুদের উভয়েরই পালন বোঝায়। আধুনিক সমাজে চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা হয় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় নেই, তা বৈশ্য এবং শূদ্রের রাষ্ট্র, এবং পূর্বের মতো ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের রাষ্ট্র নয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং তাঁর পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজা, কেননা তাঁরা সমস্ত মানুষ এবং পশুদের সংরক্ষণ করেছিলেন। মূর্তিমান কলি যখন গোহত্যা করার চেষ্টা করে, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখনই সেই দুষ্কৃতকারীকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন, এবং তিনি কলিকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। এইটিই হচ্ছে পুরুষ বা বিষ্ণুর প্রতিনিধির লক্ষণ। বৈদিক সভ্যতায় আদর্শ ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের মতো সম্মান প্রদর্শন করা হত, কেননা তিনি প্রজা পালন করে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করতেন। আধুনিক যুগে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্র-প্রধানেরা চোরদের হাত থেকে পর্যন্ত জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারে না, তাই মানুষকে ইন্সুরেন্স কোম্পানির শরণাপন্ন হতে হয়। আধুনিক মানবসমাজের সমস্যাগুলির কারণ হচ্ছে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের অভাব, এবং তথাকথিত সর্বসাধারণের মতাধিকারের দ্বারা বৈশ্য ও শূদ্রদের অতিরিক্ত প্রভাব।

শ্লোক ৩২

বিশোঽবর্তন্ত তস্যোর্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্তাং নৃণাং যঃ সমবর্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

বিশঃ—উৎপাদন এবং বিতরণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ; **অবর্তন্ত**—উৎপন্ন হয়েছে; **তস্য**—তাঁর (বিরাটরূপের); **উর্বোঃ**—উরুদ্বয় থেকে; **লোক-বৃত্তিকরীঃ**—জীবিকা; **বিভোঃ**—ভগবানের; **বৈশ্যঃ**—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়; **তৎ**—তাদের; **উদ্ভবঃ**—জন্ম; **বার্তাম্**—জীবনধারণের উপায়; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যঃ**—যিনি; **সম-বর্তয়ৎ**—সম্পাদন করেছে।

অনুবাদ

সমস্ত মানুষের জীবিকা, অর্থাৎ শস্য উৎপাদন এবং প্রজাদের মধ্যে তার বিতরণ করার বৃত্তি ভগবানের বিরাটরূপের উরুদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কার্য সম্পাদন করার ভার গ্রহণ করেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁদের বলা হয় বৈশ্য।

তাৎপর্য

মানবসমাজের জীবিকা নির্বাহের উপায়কে এখানে স্পষ্টভাবে *বিশ,* বা কৃষি ও বাণিজ্যকে বোঝানো হয়েছে। কৃষিকার্যের মাধ্যমে খাদ্য-শস্য উৎপাদন এবং সেইগুলির সরবরাহ, অর্থের লেনদেন ইত্যাদি তার অন্তর্গত। যান্ত্রিক উদ্যোগ হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের কৃত্রিম উপায়, এবং বিশেষভাবে বড় বড় কলকারখানাগুলি হচ্ছে সমাজের সমস্ত সমস্যার উৎস। ভগবদ্গীতাতেও কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য *বিশ* কার্যে নিযুক্ত বৈশ্যদের বৃত্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, মানুষ নির্ভয়ে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য গাভী এবং কৃষিযোগ্য ভূমির উপর নির্ভর করতে পারে।

অর্থের লেনদেন এবং তার সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদনের বিনিময় হচ্ছে এই প্রকার জীবিকার একটি শাখা। বৈশ্য সম্প্রদায় কতকগুলি শাখায় বিভক্ত—যথা, *ক্ষেত্রী* বা ভূমিপতি, *কৃষণ* বা ভূমি-কর্ষণকারী, *তিলবণিক* বা শস্য উৎপাদক, *গন্ধ-বণিক* বা মশলার ব্যাপারি, *সুবর্ণ-বণিক* বা স্বর্ণের ব্যাপারি এবং সাহুকার ইত্যাদি। ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন শিক্ষক এবং পারমার্থিক গুরু, ক্ষত্রিয়েরা চোর এবং দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করেন, আর বৈশ্যদের দায়িত্ব হচ্ছে

উৎপাদন এবং বিতরণ করা। শূদ্র বা বুদ্ধিহীন শ্রেণীর মানুষেরা, যারা স্বতন্ত্রভাবে উপরোক্ত বৃত্তির কোনটি করতে সক্ষম নয়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে তিনটি উচ্চতর বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা।

পুরাকালে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণদের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করতেন, কেননা ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সেই সমস্ত বস্তু সংগ্রহের সময় ছিল না। বৈশ্য এবং শূদ্রদের থেকে ক্ষত্রিয়েরা কর আদায় করতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সব রকম আয়কর অথবা ভূমিকর থেকে মুক্ত ছিলেন। মানবসমাজের এই ব্যবস্থা এত সুন্দর ছিল যে, তখন কোন রকম রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলন ছিল না। তাই, বিভিন্ন প্রকার বর্ণ-বিভাগ মানবসমাজের শান্তিপূর্ণ স্থিতির জন্য অনিবার্য।

শ্লোক ৩৩

পদ্ভ্যাং ভগবতো যজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্মসিদ্ধয়ে ।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

পদ্ভ্যাম্—পদদ্বয় থেকে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **যজ্ঞে**—প্রকট হয়েছে; **শুশ্রূষা**—সেবা; **ধর্ম**—বৃত্তি; **সিদ্ধয়ে**—উদ্দেশ্যে; **তস্যাম্**—তাতে; **জাতঃ**—উৎপন্ন হয়েছে; **পুরা**—পূর্বে; **শূদ্রঃ**—সেবক; **যৎ-বৃত্ত্যা**—যেই বৃত্তির দ্বারা; **তুষ্যতে**—সন্তুষ্ট হয়; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

তারপর, পরমেশ্বর ভগবানের পদদ্বয় থেকে ধর্ম অনুষ্ঠানের সিদ্ধির জন্য পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বিরাট পুরুষের পদদ্বয়ে শূদ্রেরা অবস্থিত, যারা সেবা বৃত্তির দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করে।

তাৎপর্য

সেবা হচ্ছে সমস্ত জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, এবং এই সেবা বৃত্তির দ্বারা তারা ধর্ম অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে কেউই সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে জ্ঞানী সম্প্রদায় কেবল আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে অনুমান করে চলে, কিন্তু জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের পর আত্মার কার্যকলাপ সম্বন্ধে

তাদের কোন ধারণা নেই। তাই বলা হয় যে, যারা কেবল বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য কেবল মানসিক জল্পনা-কল্পনা করে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয় না, তারা কেবল তাদের সময়ের অপচয় করছে।

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের পদদ্বয় থেকে পরিচর্যার বৃত্তি উৎপন্ন হয়েছে ধর্ম অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভের জন্য। কিন্তু এই অপ্রাকৃত সেবা জড় জগতের সেবার ধারণা থেকে ভিন্ন। জড় জগতে কেউই সেবক হতে চায় না; সকলে প্রভু হতে চায়, কেননা প্রভুত্ব করার ভ্রান্ত বাসনা হচ্ছে বদ্ধ জীবের মূল রোগ। জড় জগতে বদ্ধ জীব অপরের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, সে মায়ার দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। সেটি হচ্ছে বদ্ধ জীবের প্রকৃত অবস্থা। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির চরম ফাঁদ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার ধারণা, এবং এই ধারণার ফলে মোহাচ্ছন্ন জীব ভ্রান্তভাবে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, এবং 'নারায়ণের সমতুল্য' বলে মনে করে জড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ হয়ে সেবা বৃত্তির বিকাশ না করার থেকে শূদ্র হওয়া অনেক ভাল, কেননা সেই মনোভাব ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করে। প্রতিটি জীবকেই, গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ হলেও, অবশ্যই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবা করতে হয়। ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত উভয় শাস্ত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সেবা বৃত্তিই হচ্ছে জীবনের চরম পূর্ণতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র তাদের বৃত্তির পূর্ণতা সাধন করতে পারেন কেবল ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে। পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করার ফলে ব্রাহ্মণদের এই তত্ত্ব জানা উচিত। আর সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের (যাঁরা গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ এবং আচরণের দ্বারা বৈষ্ণব) নির্দেশ অনুসরণ করা। তার ফলে সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সমাজকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা যায়। অরাজক সমাজ কখনও সমাজের সদস্যদের অথবা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারে না। কেউ যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র না হওয়া সত্ত্বেও, সামাজিক উপাধির কোনও রকম সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা না করে কেবল ভগবানের সেবা করেন, তিনিও পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি এই সেবার ভাব বিকাশ করার মাধ্যমেই কেবল তাঁর মানবজীবন সার্থক করতে পারেন।

শ্লোক ৩৪

এতে বর্ণাঃ স্বধর্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্ ।
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

এতে—এই সমস্ত; **বর্ণাঃ**—সমাজের বর্ণসমূহ; **স্ব-ধর্মেণ**—স্বীয় বৃত্তিজাত কর্তব্যের দ্বারা; **যজন্তি**—আরাধনা করে; **স্ব-গুরুম্**—স্বীয় গুরু; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **আত্ম**—আত্মা; **বিশুদ্ধি-অর্থম্**—বিশুদ্ধিকরণের জন্য; **যৎ**—যার থেকে; **জাতাঃ**—উদ্ভূত হয়; **সহ**—সহ; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তি।

অনুবাদ

এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার স্ব-স্ব বৃত্তিসহ সামাজিক বিভাগ পরমেশ্বর ভগবান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই পারমার্থিক উপলব্ধি এবং মুক্ত জীবন লাভের জন্য গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, স্বীয় বৃত্তি আচরণের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হওয়ার ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমস্ত জীবেরা হচ্ছে সেই পরম শরীরের নিত্য সেবক। আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ, যেমন—মুখ, হাত, উরু, পদ ইত্যাদির উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র শরীরের সেবা করা। সেই সমস্ত অঙ্গগুলির সেইটি-ই হচ্ছে স্বভাব। মনুষ্যেতর জীবনে জীবের এই স্বভাব সম্বন্ধে ধারণা থাকে না, কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষদের তা জানা উচিত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু, এবং এইভাবে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি, যা চরমে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় পর্যবসিত হয়, তাই হচ্ছে আত্মার বিশুদ্ধিকরণের মৌলিক পন্থা।

বদ্ধ অবস্থায় জীবাত্মা মনে করে যে, সে সারা ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণার চরম স্তরে জীব নিজেকে ভগবান বলে মনে করে। মূর্খ জীবাত্মারা ভেবে দেখে না যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে পারেন না। ভগবান যদি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন, তাহলে তাঁর ভগবত্তা কোথায়? তা যদি হয়, তাহলে মায়া তো ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই, জীব যেহেতু মায়ার দ্বারা আবদ্ধ, সে কখনও ভগবান হতে পারে না। এই শ্লোকে বদ্ধ জীবের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে—সমস্ত জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের সংস্পর্শে আসার ফলে কলুষিত হয়েছে। তাই সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় তাদের পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি কেবল গুণগতভাবে ব্রাহ্মণই নন, অধিকন্তু, অবশ্যই বৈষ্ণব হবেন। সদ্‌গুরুর নির্দেশনায়, প্রামাণিক পন্থায় ভগবানের আরাধনা করাই এখানে আত্ম পবিত্রীকরণের একমাত্র পন্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এইটি হচ্ছে

পবিত্র হওয়ার স্বাভাবিক উপায়, এবং অন্য কোন পন্থাকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয়নি। পবিত্র হওয়ার অন্যান্য পন্থাগুলি এই স্তরে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু চরমে, প্রকৃত সিদ্ধি লাভের জন্য এই স্তরে উপনীত হতেই হবে। সেই সত্য প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (৭/১৯) বলা হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

শ্লোক ৩৫

এতৎক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্মাত্মরূপিণঃ ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

এতৎ—এই; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **দৈব-কর্ম-আত্ম-রূপিণঃ**—দিব্য রূপের দিব্য কর্ম, কাল এবং প্রকৃতি; **কঃ**—আর কে; **শ্রদ্দধ্যাৎ**—আকাঙ্ক্ষা করতে পারে; **উপাকর্তুম্**—সামগ্রিকভাবে নিরূপণ করে; **যোগমায়া**—অন্তরঙ্গা শক্তি; **বল-উদয়ম্**—বলের দ্বারা প্রকাশিত।

অনুবাদ

হে বিদুর! পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রকাশিত বিরাটরূপের দিব্য কাল, কর্ম এবং শক্তির মাহাত্ম্য কে নিরূপণ করতে পারে বা মাপতে পারে?

তাৎপর্য

কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিকেরা ভগবানের যোগমায়ার দ্বারা প্রদর্শিত বিরাটরূপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিরাটরূপের আয়তন মাপা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় (১১/১৬) সর্বজনস্বীকৃত ভগবদ্ভক্ত অর্জুন বলেছেন—

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

"হে প্রভু! হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! আমি সর্বত্র আপনার অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ, ও নেত্র দর্শন করছি, এবং সেই সবই অন্তহীন। আমি সেই রূপের অন্ত, মধ্য এবং আদি খুঁজে পাই না।"

ভগবদ্গীতার উপদেশ বিশেষভাবে অর্জুনকে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাঁরই অনুরোধে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন। সেই বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য তাঁকে বিশেষ দিব্য দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছিল, তবুও ভগবানের অসংখ্য বাহু, মুখ ইত্যাদি দর্শন করা সত্ত্বেও, তিনি পূর্ণরূপে তাঁকে দর্শন করতে সক্ষম হননি। অর্জুন যদি ভগবানের শক্তির আয়তন নিরূপণ করতে সক্ষম না হন, তাহলে অন্য কে তা করতে সক্ষম হবে? কূপমণ্ডুক দার্শনিকের মতো সেই সম্বন্ধে কেবল ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করা যায়। কূপমণ্ডুক দার্শনিক তিন বর্গফুট কুয়োর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগর মাপার চেষ্টা করেছিল, এবং তার ফলে সে প্রশান্ত মহাসাগরের মতো বড় হওয়ার জন্য নিজেকে ফোলাতে শুরু করে, কিন্তু অবশেষে তার শরীর ফেটে তার মৃত্যু হয়। এই কাহিনীটি সেই সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপার দুরাশা পোষণ করে। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে প্রশান্ত চিত্ত ও বিনীত ভগবদ্ভক্ত হয়ে সদ্গুরুর কাছে ভগবৎ তত্ত্ব শ্রবণ করা, এবং পূর্ববর্তী শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩৬

তথাপি কীর্তয়াম্যঙ্গ যথামতি যথাশ্রুতম্ ।
কীর্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্ ॥ ৩৬ ॥

তথা—তাই; **অপি**—যদিও; **কীর্তয়ামি**—আমি বর্ণনা করি; **অঙ্গ**—হে বিদুর! **যথা**—যতখানি; **মতি**—বুদ্ধি; **যথা**—যতখানি; **শ্রুতম্**—শ্রুত; **কীর্তিম্**—মহিমা; **হরেঃ**—ভগবানের; **স্বাম্**—স্বীয়; **সৎ-কর্তুম্**—পবিত্র করে; **গিরম্**—বাণী; **অন্যাভিধা**—অন্যথা; **অসতীম্**—অশুদ্ধ।

অনুবাদ

আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখ থেকে আমি যতটা শ্রবণ করতে পেরেছি এবং আমি নিজে যা বুঝতে পেরেছি, তার দ্বারা আমি বিশুদ্ধ বাণীর মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছি। যদি আমি তা না করি, তাহলে আমার বাক্শক্তি অসত্য থেকে যাবে।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবের বিশুদ্ধিকরণের জন্য তার চেতনার বিশুদ্ধিকরণ আবশ্যক। চেতনার উপস্থিতির দ্বারা চিন্ময় আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, এবং যখনই চেতনা শরীর থেকে চলে যায়, তখন জড় দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাই চেতনার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় কর্মসমূহের মাধ্যমে। মনোধর্মী জ্ঞানীরা যে বলে চেতনা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে, তা তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। বিশুদ্ধ চেতনার কার্যকলাপ স্তব্ধ করে মানুষের অশুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। শুদ্ধ চেতনার কার্যকলাপ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই চেতন জীবনীশক্তি অন্য কোনভাবে কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হবে, কেননা কাজে প্রবৃত্ত না হয়ে চেতনা থাকতে পারে না। চেতনা এক পলকের জন্যও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। দেহ যখন নিষ্ক্রিয় হয়, তখন চেতনা স্বপ্নরূপে কার্য করে। অচেতনতা কৃত্রিম; অস্বাভাবিক উপায়ে কিছু কালের জন্য তা স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু যখন ওষুধের প্রভাব শেষ হয়ে যায় অথবা কেউ যখন জেগে ওঠে, তখন চেতনা পুনরায় প্রকাশিত হয়ে আন্তরিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মৈত্রেয় ঋষি বলছেন যে, চেতনাকে অসৎ বৃত্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি ভগবানের অন্তহীন মহিমা বর্ণনা করার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ভগবানের এই মহিমা কীর্তন গবেষণা-প্রসূত নয়, পক্ষান্তরে, তা হচ্ছে বিনীতভাবে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শ্রবণ করার ফল। সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যা কিছু শোনা হয়েছে, তা সব পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয়, তবে সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা যতখানি সম্ভব বর্ণনা করা যেতে পারে। ভগবানের মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা না গেলেও তাতে কিছু যায় আসে না। দেহ, মন এবং বাক্যের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভগবানের দিব্য মহিমা কীর্তন করার প্রচেষ্টা করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে, তাদের কার্যকলাপ অশুদ্ধ এবং অপবিত্র থেকে যাবে। মন এবং বাণীকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার মাধ্যমেই কেবল বদ্ধ জীবের সত্তাকে পবিত্র করা সম্ভব। বৈষ্ণব ধারায় সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। এই ত্রিদণ্ড—দেহ, মন এবং বাক্য ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করার প্রতিজ্ঞার প্রতীক। কিন্তু একদণ্ডী সন্ন্যাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর মহিমা এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা যে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন, এবং এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত চিন্ময় স্বার্থের বিচারে ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, যদিও তিনি নিত্যকাল ভগবানের অপ্রাকৃত সেবকই থাকেন। ভক্তের এই যুগপৎ অভিন্ন এবং ভিন্ন স্থিতি তাঁকে চিরতরে পবিত্র করে, এবং তার ফলে তাঁর জীবন পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্লোক ৩৭

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলের্গুণবাদমাহুঃ ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামুপসম্প্রয়োগম্ ॥ ৩৭ ॥

এক-অন্ত—অতুলনীয়; **লাভম্**—লাভ; **বচসঃ**—আলোচনার দ্বারা; **নু পুংসাম্**—ভগবান সম্বন্ধে; **সু-শ্লোক**—পবিত্র; **মৌলেঃ**—কার্যকলাপ; **গুণ-বাদম্**—গুণগান; **আহুঃ**—বলা হয়; **শ্রুতেঃ**—শ্রবণেন্দ্রিয়ের; **চ**—ও; **বিদ্বদ্ভিঃ**—বিদ্বানদের দ্বারা; **উপাকৃতায়াম্**—এইভাবে নিরূপিত হয়ে; **কথা-সুধায়াম্**—এই প্রকার দিব্য কথামৃতে; **উপসম্প্রয়োগম্**—নিকটবর্তী হওয়ার ফলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করে।

অনুবাদ

পুণ্যশ্লোক ভগবানের কার্যকলাপ এবং গুণাবলী কীর্তন করাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ মহান ঋষিগণ এমনই সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, কেবল তার সমীপবর্তী হওয়ার ফলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

তাৎপর্য

নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের লীলা শ্রবণ করতে অত্যন্ত ভয় পায়, কেননা তারা মনে করে যে, ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করাই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য। তাদের ধারণা এই যে, যে কোন কার্যকলাপ, এমনকি পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপও জড়। কিন্তু, এই শ্লোকে যে আনন্দের উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভিন্ন প্রকার, কেননা তা দিব্য গুণাবলী সমন্বিত পরমেশ্বর ভগবানের লীলা সম্পর্কিত। এই শ্লোকে *গুণবাদম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবানের গুণাবলী, কার্যকলাপ এবং লীলা ভগবদ্ভক্তদের আলোচনার বিষয়। মৈত্রেয় ঋষির মতো একজন মহর্ষি অবশ্যই জড় বিষয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন যে, ভগবানের কার্যকলাপের বিষয়ে আলোচনা করাই পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ সিদ্ধি। শ্রীল জীব গোস্বামী তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বিষয় কৈবল্য আনন্দের পারমার্থিক উপলব্ধির অনেক অনেক

ঊর্ধ্বে। ভগবানের এই সমস্ত অপ্রাকৃত কার্যকলাপ মহর্ষিগণ এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তা শ্রবণ করা মাত্রই পূর্ণরূপে পারমার্থিক উপলব্ধি হয়, এবং সেই সঙ্গে শ্রবণ ও বাণীর সম্যক্ উপযোগও হয়। শ্রীমদ্ভাগবত এমনই একটি মহান শাস্ত্র, এবং সেই বিষয়ের শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলেই সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ হয়।

শ্লোক ৩৮

আত্মনোঽবসিতো বৎস মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া ॥ ৩৮ ॥

আত্মনঃ—পরমাত্মার; **অবসিতঃ**—জ্ঞাত; **বৎস**—হে আমার প্রিয় পুত্র; **মহিমা**—মহিমা; **কবিনা**—কবি ব্রহ্মা কর্তৃক; **আদিনা**—আদি; **সংবৎসর**—দিব্য বৎসর; **সহস্র-অন্তে**—সহস্র বৎসরের পর; **ধিয়া**—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; **যোগ-বিপক্কয়া**—ধ্যানের পরিপক্কতার দ্বারা।

অনুবাদ

হে বৎস! আদি কবি ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বৎসর ধ্যান করার পর, কেবল এইটুকুই জানতে পেরেছিলেন যে, পরমাত্মার মহিমা অচিন্ত্য।

তাৎপর্য

কিছু কূপমণ্ডূকসদৃশ দার্শনিক রয়েছে, যারা দর্শন এবং মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরম আত্মাকে জানতে চায়; আর ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভক্তেরা যখন বলেন যে, ভগবানের মহিমা অসীম অথবা অচিন্ত্য, তখন সেই কূপমণ্ডূকসদৃশ দার্শনিকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার মাপতে উদ্যোগী কুয়োর ব্যাঙের মতো এই সমস্ত দার্শনিকেরা আদি কবি ব্রহ্মার মতো ভক্তের উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে অর্থহীন জল্পনা-কল্পনা করার প্রয়াস করে। ব্রহ্মা এক হাজার দিব্য বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন যে, ভগবানের মহিমা অবিজ্ঞেয়। সুতরাং কূপমণ্ডূকসদৃশ দার্শনিকেরা তাদের মনের জল্পনা-কল্পনার দ্বারা কি লাভ করার আশা করতে পারে?

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, মনোধর্মী মুনি যদি মন অথবা বায়ুর বেগে লক্ষ কোটি বছর ধরেও ধাবিত হন, তবুও তিনি তাঁকে জানতে পারবেন না। কিন্তু

ভগবদ্ভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানার এই প্রকার অর্থহীন প্রচেষ্টায় তাঁদের সময়ের অপচয় করেন না, পক্ষান্তরে, তাঁরা বিনীতভাবে ভগবানের ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন। এইভাবে তাঁরা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে দিব্য আনন্দ উপভোগ করেন। ভক্তের বা মহাত্মাদের ভক্তিপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের অনুমোদন করে ভগবান বলেছেন—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥

(ভগবদ্গীতা ৯/১৩-১৪)

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা লক্ষ্মীদেবী, সীতাদেবী, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী অথবা শ্রীমতী রাধারাণী নামক ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা পরা প্রকৃতির শরণ গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তাঁরা প্রকৃত মহাত্মায় পরিণত হন। মহাত্মারা মানসিক জল্পনা-কল্পনায় প্রবৃত্ত হতে চান না, কিন্তু তাঁরা অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। ভগবদ্ভক্তির প্রকাশ হয় ভগবানের লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করার প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মহাত্মারা যে এই দিব্য পন্থা অনুশীলন করেন, তার ফলে ভগবান সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ হয়, কেননা ভগবানকে যদি কোন প্রকারে জানা সম্ভব হয়, তাহলে ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নয়। মনের জল্পনা-কল্পনা করার মাধ্যমে কেউ তার দুর্লভ মানবজীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে পারে, কিন্তু তার ফলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভে তা কোন প্রকারে সহায়ক হবে না। মহাত্মারা কিন্তু মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ভগবানকে জানার ব্যাপারে একেবারেই আগ্রহী নন, কেননা তাঁর ভক্ত অথবা অসুরদের সঙ্গে তাঁর অপ্রাকৃত আচরণ এবং মহিমামণ্ডিত ব্যবহারের কথা শ্রবণ করার মাধ্যমেই তাঁরা আনন্দ আস্বাদন করেন। ভক্তেরা উভয় ক্ষেত্রেই আনন্দ আস্বাদন করেন, এবং তাঁরা এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনেও সুখী হন।

শ্লোক ৩৯

অতো ভগবতো মায়া মায়িনামপি মোহিনী ।
যৎস্বয়ং চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৯ ॥

অতঃ—অতএব; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **মায়া**—শক্তি; **মায়িনাম্**—যাদুকরদের; **অপি**—ও; **মোহিনী**—মোহজনক; **যৎ**—যা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **চ**—ও; **আত্ম-বর্ত্ম**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **আত্মা**—আত্মা; **ন**—করে না; **বেদ**—জানে; **কিম্**—কি; **উত**—বলার আছে; **অপরে**—অন্যদের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের আশ্চর্যজনক শক্তি ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকারী মায়াবাদীদের পর্যন্ত সম্মোহিত করে। ভগবানের এই শক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবানেরও অজ্ঞাত, অতএব অপর ব্যক্তির আর কি কথা।

তাৎপর্য

কূপমণ্ডুকসদৃশ দার্শনিক এবং জড় বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে বাদ-বিবাদকারী ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও তারা মানুষ এবং প্রকৃতির আশ্চর্যজনক ইন্দ্রজাল দর্শন করে বিমোহিত হয়। জড় জগতের এই প্রকার বাজিকর এবং যাদুকরেরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দিব্য কার্যকলাপের ভেলকিবাজি দর্শন করে বিমোহিত হয়, কিন্তু তারা তাদের সেই মোহ এই বলে মীমাংসা করার চেষ্টা করে যে, এই সব হচ্ছে পৌরাণিক গালগল্প। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয় অথবা মিথ্যা পৌরাণিক গল্প নয়। বাক্-বিতণ্ডাকারী জড়বাদীদের কাছে সবচাইতে আশ্চর্যজনক ধাঁধা হচ্ছে যে, তারা যখন পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ মাপবার চেষ্টা করে, তখন ভগবানের বিশ্বস্ত ভক্তেরা কেবল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ভগবানের ভক্ত খেতে, শুতে, কাজ করতে, ইত্যাদি সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের আশ্চর্যজনক নিপুণতা দর্শন করেন। একটি ক্ষুদ্র বট ফলে হাজার হাজার ক্ষুদ্র বীজ রয়েছে, এবং প্রতিটি বীজে এক-একটি বটবৃক্ষ নিহিত রয়েছে, সেইগুলিতে আবার কারণ এবং কার্যরূপে কোটি কোটি ফল রয়েছে। এইভাবে বৃক্ষ এবং বীজ ভগবদ্ভক্তদের ভগবানের কার্যকলাপের ধ্যানে মগ্ন করে; পক্ষান্তরে, লৌকিক বিবাদ-প্রিয় মানুষেরা শুষ্ক জল্পনা-কল্পনা আর মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করে তাদের সময় নষ্ট করে, যা এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে অর্থাৎ উভয় জীবনেই নিরর্থক

হয়। জল্পনা-কল্পনার গর্বে তাদের গর্বিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনও বটবৃক্ষের সরল প্রসুপ্ত ক্রিয়াশীলতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। এই প্রকার মনোধর্মীরা হচ্ছে দুর্ভাগা জীব, যারা অনন্তকাল ধরে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ৪০

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ ।
অহং চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৪০ ॥

যতঃ—যাঁর থেকে; **অপ্রাপ্য**—মাপতে অসমর্থ হয়ে; **ন্যবর্তন্ত**—চেষ্টা থেকে বিরত হয়; **বাচঃ**—বাণী; **চ**—ও; **মনসা**—মনের দ্বারা; **সহ**—সহ; **অহম্ চ**—অহঙ্কারও; **অন্যে**—অন্য; **ইমে**—এই সমস্ত; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **তস্মৈ**—তাঁকে; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **নমঃ**—প্রণতি বিবেদন করেন।

অনুবাদ

বাণী, মন এবং অহঙ্কার তাদের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাগণসহ ভগবানকে জানতে অসমর্থ হয়েছে। তাই, আমাদের প্রকৃতিস্থ হয়ে তাঁর প্রতি শুধু আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে হবে।

তাৎপর্য

কূপমণ্ডুকসদৃশ অনুমানকারীরা আপত্তি করতে পারে যে, যদি ভগবান বাণী, মন এবং অহঙ্কারের নিয়ন্ত্রণকারী দেবতাদেরও, অর্থাৎ বেদ, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বৃহস্পতি প্রমুখ দেবতাদেরও অজ্ঞেয় হন, তাহলে সেই অজ্ঞেয় বস্তুটিকে জানবার জন্য ভক্তেরা এত আগ্রহী হন কেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, ভগবানের লীলাসমূহের বর্ণনায় ভক্তদের যে দিব্য আনন্দের অনুভূতি হয়, তা অভক্তদের এবং মনোধর্মীদের কাছে নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়। দিব্য আনন্দের আস্বাদন না হলে, স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা-কল্পনা এবং অনুমানের স্তর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হবে, কেননা তারা দেখতে পাবে যে, সেইগুলি বাস্তব নয় এবং আনন্দদায়ক নয়। ভগবদ্ভক্তেরা অন্তত জানেন যে, পরম সত্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বৈদিক স্তোত্রে যা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ* । ভগবদ্গীতাতেও (১৫/১৫) সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ* । বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য অহম্ বা 'আমি' সম্বন্ধে ভ্রান্ত জল্পনা-কল্পনা

করা নয়, পক্ষান্তরে, বৈদিক জ্ঞান অনুশীলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা। পরমতত্ত্বকে জানার একমাত্র পন্থা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, এই কথা ভগবদ্‌গীতায় (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল জানা যায় যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁর আংশিক প্রকাশমাত্র। সেই সত্য এই শ্লোকে মহর্ষি মৈত্রেয় কর্তৃক প্রতিপন্ন হয়েছে। ভক্তি সহকারে প্রণতি (*নমঃ*) নিবেদন করার মাধ্যমে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে (*ভগবতে*) ঐকান্তিকভাবে শরণাগত হয়েছেন। কেউ যদি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারও ঊর্ধ্বে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে চান, তাহলে তাঁকে মৈত্রেয়, বিদুর, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামীর মতো মহান ঋষি এবং ভগবদ্ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বিশ্বরূপের সৃষ্টি' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।